পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির

২৮ বছরপূর্তি

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

আহ্বায়ক
পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটি
ও
উপদেষ্টা, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

বাণী

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২৮তম বার্ষিকীতে আমি পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী সব সম্প্রদায়সহ সমগ্র দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত এই চুক্তি ছিল শান্তি ও সহাবস্থানের এক অনন্য মাইলফলক। এর মাধ্যমে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর অধিকার, সংস্কৃতি ও জীবনধারার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে। একই সঙ্গে প্রবর্তিত হয়েছে বিশেষ প্রশাসনিক ব্যবস্থা, যা আজও শান্তি ও উন্নয়নের ভিত্তি হয়ে আছে।

চুক্তি বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় গঠিত হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ এবং পুনর্গঠন করা হয়েছে তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদ। এছাড়া শরণার্থী প্রত্যাবাসন টাস্কফোর্সও যথাযথ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এসব প্রতিষ্ঠান সমন্বিতভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে, যাতে পাহাড়ের মানুষ জাতীয় মূল স্রোতে যুক্ত হতে পারে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পর থেকে শান্তির পথ সুগম হয়েছে। পাহাড়ি অঞ্চলের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সরকার গুণগত শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, বিদ্যুৎ, অবকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে কাজ করছে। তথ্যপ্রযুক্তি ও মোবাইল নেটওয়ার্কের প্রসার পাহাড়ি জনজীবনে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলেছে।

বর্তমান সরকার অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে বিশ্বাসী। পাহাড়ের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কৃষি উন্নয়নে কফি, কাজু বাদাম, বাঁশ, ইক্ষু ও মিশ্র ফল চাষে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। বন সংরক্ষণ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় নেওয়া হয়েছে বিশেষ উদ্যোগ। অসচ্ছল পরিবারের নারীদের জন্য গাভী পালন প্রকল্প চালু করা হয়েছে, যা তাদের আর্থিক স্বনির্ভরতায় সহায়তা করছে।

চুক্তি বাস্তবায়নের পর পর্যটন শিল্পেও নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের নৈসর্গিক সৌন্দর্য দেশি-বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণ করছে। সরকার পরিবেশ সংরক্ষণ নিশ্চিত করে পর্যটন শিল্পের বিকাশে কাজ করছে। ইকো-সিস্টেম অক্ষুণ্ন রেখে মাস্টার প্ল্যানের অধীনে টেকসই পর্যটন সুবিধা গড়ে তোলা হচ্ছে। পাহাড়ের মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, কৃষি ও পর্যটনের প্রসার, বন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ-সবকিছু মিলিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম আজ উন্নয়ন ও শান্তির পথে দৃঢ়ভাবে অগ্রসরমান।

আমি বিশ্বাস করি, পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি আমাদের জাতীয় ঐক্য ও অগ্রগতির প্রতীক হয়ে থাকবে। পাহাড়ের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আমরা গড়ে তুলব সমৃদ্ধ বাংলাদেশ।

মোঃ তৌহিদ হোসেন

পার্বত্য চট্টগ্রামের টেকসই উন্নয়ন: সমৃদ্ধির পথে আমাদের সম্মিলিত করণীয়

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২৮তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে এই অঞ্চলের সকল ভাষা-ভাষী সংস্কৃতির জনগণের সাথে একাত্ম হয়ে এ মহান দিবসটি পালনে সহযোগী। বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম সংহতি সমিতির মধ্যে সম্পাদিত এই চুক্তিটি বান্দরবান, খাগড়াছড়ি এবং রাঙামাটি- এই তিন পার্বত্য জেলার সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, বৈচিত্র্যময় জাতিসত্তা এবং তাদের উন্নয়নের জন্য এক ঐতিহাসিক মাইলফলক। এই চুক্তি দীর্ঘদিনের উন্নয়ন বঞ্চনা, জাতিগত বৈষম্য এবং অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে সহায়তা করছে। যদিও চুক্তিটি পার্বত্য তিন জেলায় সামাজিক জীবনে গতিশীলতা এনেছে, তবুও দেশের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে এর ভূ-প্রাকৃতিক সম্পদ ও বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতিকে কাজে লাগিয়ে একটি টেকসই, পরিবেশবান্ধব, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বহুমুখী উন্নয়ন নিশ্চিত করা বর্তমান সময়ের প্রধান দাবি। এই সামগ্রিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে অবকাঠামো, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, সামাজিক ন্যায্যতা, পরিবেশ সুরক্ষা এবং রাজনৈতিক সমঝোতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

প্রথমত, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি (১৯৯৭) সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করা জরুরি, যা এই অঞ্চলের মানুষের বৈষম্য নিরসন এবং সকল সম্প্রদায়ের জন্য রাজনৈতিক অধিকার ও সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে স্বাক্ষরিত হয়েছিল। স্থানীয় শাসন কাঠামোকে শক্তিশালী করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় স্থানীয় নেতাদের ন্যায্য অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। চুক্তির নির্দেশনা মেনে, পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদের মতো স্থানীয় পরিষদগুলোর ভূমিকাকে আরও শক্তিশালী করা এবং বিরোধ নিষ্পত্তি ও সহিংসতা প্রতিরোধের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা স্থাপন করা আবশ্যক। তা ছাড়াও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে সুশাসনকে জোরদার করা জরুরি। নির্বাচিত প্রতিনিধি কর্তৃক প্রতিষ্ঠানসমূহকে আরো যুগোপযোগী ও কর্মের দক্ষতা বাড়াবে যা পার্বত্য অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক, গুণগত শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, পরিবেশ উন্নয়নসহ নানাবিধ কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করবে।

দ্বিতীয়ত, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য। বাণিজ্য এবং প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলি সহজে প্রাপ্তির সুবিধার্থে সড়ক নেটওয়ার্কের মান বাড়াতে হবে এবং প্রত্যন্ত গ্রামগুলিকে জেলা-উপজেলা শহরের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। তথ্য, দূরবর্তী শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং অর্থনৈতিক সুযোগ বাড়াতে ইন্টারনেট ও মোবাইল নেটওয়ার্ক কভারেজ প্রসারিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ডিজিটাল সংযোগের অভাব সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বড়ো বাধা। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য বিদ্যুতের আওতা সম্প্রসারণ করা প্রধান কর্তব্য। দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলের প্রায় আড়াই লক্ষ বিদ্যুৎ-বিচ্ছিন্ন পরিবারকে জাতীয় গ্রিড বা নবায়নযোগ্য জ্বালানি (যেমন সোলার প্যানেল) সরবরাহের মাধ্যমে শতভাগ বিদ্যুতায়ন নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

তৃতীয়ত, টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে। এখানকার জনগণের জীবিকা বিকাশের জন্য জলবায়ু-সহিষ্ণু কৃষি পদ্ধতি, জৈব চাষ এবং কৃষি-বনায়ন কৌশলের প্রবর্তন করা জরুরি, যা পরিবেশের ক্ষতি না করে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সাহায্য করবে। ইকো-ট্যুরিজম এবং সম্প্রদায়ভিত্তিক পর্যটনকে উন্নীত করে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে কাজে লাগানো উচিত, তবে তা স্থানীয় সংস্কৃতি ও পরিবেশগত স্থায়িত্বের প্রতি সংবেদনশীল হতে হবে। স্থানীয় উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে হস্তশিল্প, বাঁশের পণ্য ও ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্পের মতো ছোট শিল্পে আর্থিক সহায়তা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা যায়। ন্যায্য বাণিজ্যিক ব্যবস্থা, সমবায় গঠন এবং উন্নত অবকাঠামো তৈরির মাধ্যমে স্থানীয় পণ্যের মূল্য সংযোজন করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশাধিকার সহজলভ্য করা হলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটবে।

চতুর্থত, সকল সম্প্রদায়ের জন্য মানসম্মত মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার সুবিধা নিশ্চিত করে শিক্ষায় পিছিয়ে থাকা পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হবে। অন্তর্ভুক্তির জন্য স্কুল পাঠ্যসূচিতে জাতিগত ভাষা, ঐতিহ্য ও ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। কর্মসংস্থান ও আত্মনির্ভরশীলতা বাড়াতে নির্মাণ, আইটি, হস্তশিল্প এবং ইকো-ট্যুরিজমের ওপর জোর দিয়ে বৃত্তিমূলক ও দক্ষতা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রদান করা উচিত। যোগ্য শিক্ষকদের জন্য প্রণোদনা দেওয়া এবং শিক্ষকদেরকে সাংস্কৃতিকভাবে সংবেদনশীল পদ্ধতির প্রশিক্ষণ দেওয়া শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য অপরিহার্য।

পঞ্চমত, প্রত্যন্ত অঞ্চলে হাসপাতাল, ক্লিনিক এবং মোবাইল হেলথ ইউনিট-সহ স্বাস্থ্যসেবা অবকাঠামো উন্নত করতে হবে। মা ও শিশু স্বাস্থ্য এবং মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া জরুরি। স্থানীয় স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ ও নিয়োগের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে সাংস্কৃতিক দূরত্ব হ্রাস করা যায়।

ষষ্ঠত, পরিবেশ সুরক্ষার জন্য টেকসই বন ব্যবস্থাপনা ও বনায়ন অপরিহার্য। জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে জলবায়ু-সহিষ্ণু কৃষি-কৌশল প্রবর্তন এবং শুষ্ক মৌসুমে পানির সহজপ্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে স্রোত ও জলাশয় পুনরুজ্জীবিত করার ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

সপ্তম, সামাজিক বৈষম্য নিরসনে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভূমিকায় নারীদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা প্রয়োজন। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য কমাতে লক্ষ্যভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি, যেমন: নগদ অর্থ স্থানান্তর, খাদ্য নিরাপত্তা এবং আবাসন প্রকল্প চালু করা আবশ্যক।

অষ্টমত, জাতিগত ও বাঙালি সম্প্রদায়ের মধ্যে সংলাপ ও বোঝাপড়ার পরিবেশ তৈরি করে আন্তঃসাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সামাজিক সংহতি গড়ে তুলতে হবে। সাংস্কৃতিক উৎসব ও যৌথ উন্নয়ন প্রকল্প এই ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে। সবশেষে, আইনশৃঙ্খলা জোরদারকরণ ও আইনের শাসন নিশ্চিত করে সকল মানুষের মানবাধিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে নিরপেক্ষভাবে জমি দখল ও বন উজাড়ের মতো অবৈধ কার্যকলাপ মোকাবিলা করতে হবে।

এখানে উল্লেখ্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছে। বর্তমানে রাস্তা ঘাটের অবকাঠামো উন্নয়ন আগের যে-কোনো সময়ের তুলনায় ভালো। কৃষি ও ফলজ বাগান উন্নয়নে অগ্রগামী ভূমিকা রাখছে। অন্যান্য সামাজিক সূচক এখনো বাংলাদেশের যে-কোনো জেলার তুলনায় কম, তবে তাও ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে। মন্ত্রণালয় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, পার্বত্য অঞ্চলের নেতৃত্ব যদি মানসম্মত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবিকা উন্নয়নসহ অন্যান্য খাতে মনোনিবেশ করত তাহলে, তা অনেক ভালো হতে পারত। বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়নে পূর্ণ সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস পার্বত্য অঞ্চলে ১০০টি ডিজিটাল স্কুল স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছেন, যা বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা জনাব সুপ্রদীপ চাকমা মন্ত্রণালয়ের আগমনের প্রথম দিন থেকে পার্বত্য অঞ্চলে গুণগত শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জীবিকা উন্নয়নের লক্ষ্যে উদ্যোক্তা তৈরিতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। দুর্ভাগ্যবশত, জীবিকা উন্নয়নের খাতে ব্যয়িত টিআর ও জিআর উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে ও আত্ম-কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সৎ ব্যবহার হয়েছে বলে অনেকে মনে করছেন না। তাছাড়াও মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের কাছ থেকে আশানুরূপ সহযোগিতার অভাব দেখতে পাওয়া যায়। তাই জীবিকা উন্নয়ন ও গুণগত শিক্ষার উন্নয়নের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় প্রদত্ত টিআর ও জিআর-এর অপব্যবহারের অভিযোগ পাওয়া যায়। এটা ঠিক যে, গুণগত শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মান উন্নত করা, উদ্যোক্তা তৈরি, কৃষি ও পরিবেশের মাধ্যমে জীবিকা উন্নয়ন, সকল প্রতিষ্ঠানের ও উপকারভোগীর যৌথ প্রচেষ্টা। তাই, জাতীয় ও আঞ্চলিক রাজনীতি, গুণগত শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, উদ্যোক্তা তৈরি, কৃষি ও পরিবেশ উন্নয়নে সচেষ্ট হলে কেবল পার্বত্য অঞ্চল উন্নয়নের দিশা দেখতে পাবে। পার্বত্য অঞ্চলে ব্যাপকহারে চাঁদাবাজি ও সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টির অপচেষ্টা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও জীবিকা উন্নয়নসহ সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাদের উদ্যোগকে নিরুৎসাহিত করছে।

উপসংহারে বলা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের উন্নয়ন অবশ্যই একটি সমন্বিত, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সহযোগিতামূলক পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে হতে হবে, যা স্থানীয় সংস্কৃতি ও সরকারকে সম্মান করে। স্থানীয় জনসংখ্যার ক্ষমতায়ন, তাদের অধিকারের সুরক্ষা এবং সকলের উপকারে আসে এমন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করাই স্থায়ী পরিবর্তনের মূল ভিত্তি। তা প্রধানত করবে- তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও ১৯৭৬ সালে স্থাপিত পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড। স্থানীয় অংশীজনদের সক্রিয় সম্পৃক্ততা, শান্তি-নির্মাণে অঙ্গীকার এবং পরিবেশগত স্থায়িত্ব নিশ্চিত করাই এই অঞ্চলের উন্নয়নকে কার্যকর ও ন্যায়সংগত করার মূল চাবিকাঠি।

লেখক: মোঃ মনিরুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

উপদেষ্টা
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

০২ ডিসেম্বর। ১৯৯৭ সালের এই দিনে ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত দিন। এই চুক্তি দীর্ঘদিনের সংঘাত, অবিশ্বাস ও অস্থিরতার অবসান ঘটিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে শান্তি, সম্প্রীতি ও উন্নয়নের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। আজ এই চুক্তির ২৮তম বছর পূর্তি উপলক্ষে আমি পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্বস্তরের জনগণের প্রতি জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

এই চুক্তি কেবল একটি রাজনৈতিক সমঝোতা ছিল না, এটি ছিল দেশের সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আনুগত্য রেখে শান্তি, সহাবস্থান এবং ন্যায্যতার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত একটি মহৎ অঙ্গীকার। চুক্তিটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক বাংলাদেশ গঠনের অগ্রযাত্রাকে আরও বেগবান করেছে।

গত ২৮ বছর ধরে সরকার ধারাবাহিকভাবে চুক্তির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। এর ফলস্বরূপ, পার্বত্য অঞ্চলে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয়, আঞ্চলিক পরিষদ ও তিনটি জেলা পরিষদ গঠিত হয়েছে, যা এই অঞ্চলের জনগণের অংশগ্রহণমূলক শাসন কাঠামোকে দৃঢ় ভিত্তি দিয়েছে।

চুক্তি বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ, তথ্যপ্রযুক্তি, আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও পর্যটনসহ অন্যান্য খাতে অনেক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে, তবে আরো হতে পারতো। প্রত্যন্ত অঞ্চলে আধুনিক ই-লার্নিং সুবিধা পৌঁছানো থেকে শুরু করে সমতাভিত্তিক জীবনমান উন্নয়নে নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সরকার টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নেও নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

তবে উন্নয়নের এই অগ্রযাত্রাকে টেকসই করতে হলে প্রয়োজন পারস্পরিক আস্থা, সহযোগিতা ও সম্প্রীতির সংস্কৃতি আরও শক্তিশালী করা। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সম্প্রদায়- একে অপরের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও জীবনধারাকে সম্মান জানিয়ে সম্মিলিত ভাবে এগিয়ে গেলে এই অঞ্চল সত্যিকারের শান্তি ও অগ্রগতির মডেলে পরিণত হবে।

আমি পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি-বাঙালিসহ সমগ্র বাংলাদেশের মানুষের অব্যাহত শান্তি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

সুপ্রদীপ চাকমা

সচিব
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বাণী

আজ ২ ডিসেম্বর। ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বর্ষপূর্তির এই শুভক্ষণে, আমি পার্বত্যবাসীসহ বাংলাদেশের সকল শান্তিপ্রিয় জনগণকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

১৯৯৭ সালের এই দিনে বাংলাদেশ সরকার এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে যুগান্তকারী এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর ধারাবাহিকতায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, পার্বত্য তিন জেলা পরিষদ এবং ১৯৯৮ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠনের মাধ্যমে চুক্তির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়।

চুক্তির শর্তানুযায়ী, পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকার মানোন্নয়নের জন্য বহুমুখী উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে সেই উন্নয়নের ধারা আরও গতিশীল ও সুদৃঢ় হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া সক্রিয়ভাবে চলমান রয়েছে। ঢাকার বেইলী রোডে স্থাপিত শৈল্পিক ও নান্দনিক পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্সের মাধ্যমে পার্বত্যবাসীর ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং বিকাশের পাশাপাশি সমতলের মানুষের সঙ্গে তাদের মেলবন্ধন আরও সুদৃঢ় হচ্ছে।

চুক্তি বাস্তবায়নের পর বাংলাদেশের এক দশমাংশ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের উন্নয়ন কার্যক্রমে এক নতুন গতির সঞ্চার হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে নতুন রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ, ও কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। জনগণের কল্যাণে গড়ে উঠেছে স্বাস্থ্য কেন্দ্র, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প।

তিন পার্বত্য জেলার কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিসাধন, সামাজিক সুরক্ষা, এবং নারী ও শিশু উন্নয়নসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও ৩ জেলা পরিষদের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও সুসংহত করা হয়েছে। দুর্গম এলাকার নারী ও শিশুদের মৌলিক স্বাস্থ্য সেবা ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের জন্য নেওয়া হয়েছে টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান কর্মসূচি।

মানসম্মত শিক্ষা, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে সরকার এই অঞ্চলের উন্নয়নে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ফলস্বরূপ, মানুষের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সফল বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে পার্বত্য এলাকায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং পারস্পরিক সহনশীলতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির এই ২৮ বছর পূর্তিতে আমি প্রত্যাশা করি, শান্তি ও উন্নয়নের এই অভিযাত্রা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকুক।

মোঃ আব্দুল খালেক